গল্প: আলো আঁধারের খেলা

কামাল কাদের | 1 দিন পূর্বে | বুকমার্ক করুন

সর্বশেষ হালনাগাদ: ৬ এপ্রিল, ২০২৩, সময় ২:২৬ অপরাহ্ন
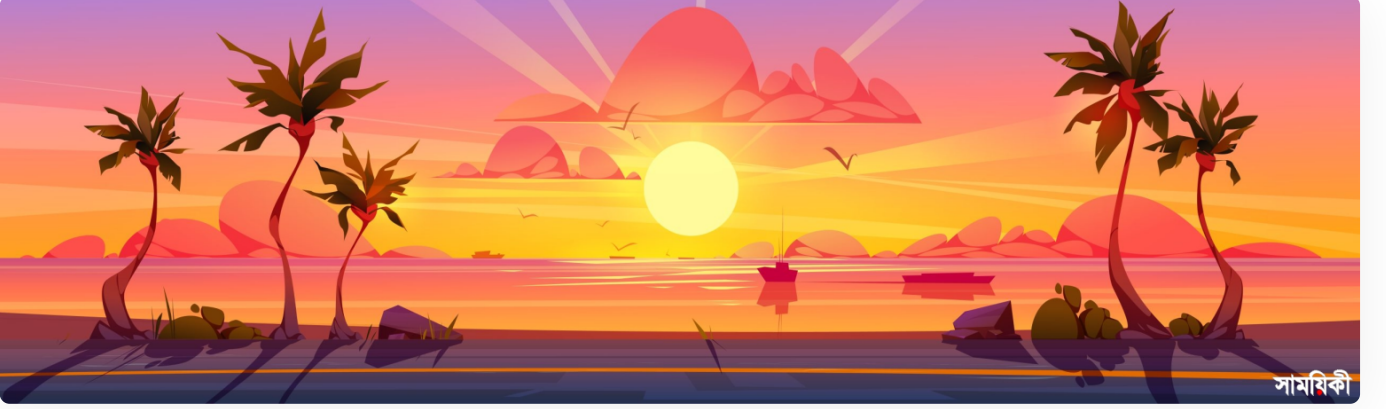
জন্ম-মৃত্যু, জীবন-জীবিকা এ সবই ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। হারুন-উর-রশীদ সাহেবের মনটা ভীষণ খারাপ। আজ উনার এম এ,পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। অল্পের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পেলেন না। ইংরেজী সাহিত্যে থার্ড ক্লাস পেয়েছেন। তার মানে কলেজে লেকচারের চাকরীর জন্য তিনি অনুপযুক্ত। কি আর করা! বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক পদের জন্য দরখাস্ত করতে শুরু করলেন। ভাগ্যক্রমে এক সরকারী স্কুলে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদে নিয়োগ পেলেন। শিক্ষকতার চাকরী নেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেকেন্ড ক্লাস পাবার জন্য তিনি পুনরায় এম এ পরীক্ষা দেবেন। অন্য পেশার তুলনায় এই স্কুলের শিক্ষকতা পেশায় প্রচুর ছুটি-ছাটা আছে,, লেখাপড়ার পরিবেশও ভালো রয়েছে। তাছাড়া স্কুলের ছেলেদের পড়াবার জন্য আহামরি খুব বেশী খাটুনী করতে হবে না। একেবারে বেকার হওয়ার চাইতে পকেটে কিছু টাকা পয়সা আসবে, একাকী জীবন ভালোভাবেই কেটে যাবে। পরন্তু নিজের লেখা পড়ার প্রতি সময় দিতে পারবেন।

চাকরীটা মন্দ লাগছে না। স্কুলটির নাম "ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ" দিনের বেলায় এসএসসি পর্যন্ত আর সন্ধ্যা বেলায় এইচএসসি কোর্সের ক্লাস হয়ে থাকে। একজন হেড মাস্টার মহোদয় স্কুল পরিচালনা করেন এবং একজন বিলাত ফেরত প্রিন্সিপাল সাহেব কলেজ পরিচালনা করেন।

ছাত্র জীবনে হারুন সাহেব EPSU (ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) করে বেড়াতেন,ব লা যায় রীতিমতো সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করে

সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো আপামর জনসাধারণের জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন এবং দেশকে পুঁজিবাদী ধনবানদের কবল থেকে মুক্ত করে দিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ছাত্র জীবন শেষ করার পর সেই আদর্শবাদীতা আর রইলো না। সমস্ত কিছু ভেস্তে গেছে বাস্তবতার তাগিদে।

অনেক পরিশ্রমের ফলে পরবর্তী এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে গেলেন। কলেজে চাকরীর আবেদনের আর বড় কোনো বাধা থাকলোনা। স্কুলের চাকরী আর মনোপুত হচ্ছেনা তার। স্কুলের চাকরী থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে পরা যায় ততই মঙ্গল। তাছাড়া আরও আরেকটা বিশেষ কারণ হলো "ভয়" এবং এই ভয়ের কবলে পড়ে তিনি ভীষণ অস্থিরতায় ভুগছিলেন। ব্যাপারটা খোলাসা করেই বলা যাক।

স্কুলটায় রাতে ইন্টারমেডিয়েট ক্লাস হওয়ার সুবাদে প্রতি বছর অন্য কলেজের পরীক্ষার্থীরা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ওই স্কুলে এন্ড কলেজে পরীক্ষা দিতে আসেন। পরীক্ষার হলে পরিদর্শক হিসাবে অন্যান্য শিক্ষকের মতো হারুন সাহেবকেও নিযুক্ত করা হলো। স্কুলের বেতন ছাড়াও পরিদর্শক হিসাবে কাজের জন্য একটা মোটা অংকের টাকা পাওয়া যায়। সেই জন্য হারুন সাহেব কাজটা হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। বয়সে তরুণ অতিরিক্ত পয়সা আসলে ক্ষতি কি? কিন্তু এই অতিরিক্ত পয়সা কামাই করতে গিয়ে তার যে অভিজ্ঞতা হলো,তা ভাবলে আজ ও ভয়ে তিনি কোনঠাসা হয়ে পড়েন।
বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থীরা মধ্যেবয়স্ক বা তারও উপরে। তারা দিনের বেলায় কোন না কোনো জায়গায় কাজ করেন এবং নাইট কলেজে লেখাপড়া করেন। তার মাঝে কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী উনার সময় বয়সী ও রয়েছে। পরীক্ষার হলে ঢুকার পর হারুন সাহেব যা দেখলেন তাতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। প্রায় সবাই বই দেখে নকল করে পরীক্ষার খাতায় লেখে চলছে। কাছের একজন বয়স্ক পরীক্ষার্থী যিনি পরম তৃপ্তির সাথে পান চিবুচ্ছেন এবং পরীক্ষার খাতায় নকল টুকছেন তার সামনে গিয়ে বললেন, "আপনার সাহস তো কম না। আমাকে দেখেও আপনি সমানে নকল করে যাচ্ছেন, এটা কি রকম বেয়াদবী!"

পরিক্ষার্থী একটু মৃদু হেসে জানালো, “স্যার, আমরা তো B C S (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) অফিসার হবোনা, তাই জ্ঞান আরোহনের কোনো প্রয়োজন মনে করিনা। যদি পরীক্ষাটা পাস করতে পারি, তাহলে এই সার্টিফিকেট দেখিয়ে একটা প্রোমোশনের জন্য বড় সাহেবের কাছে আবেদন করতে পারবো। যার ফলে বেতন বাড়বে এবং আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হবো।”

তাই বলে আমার চোখের সামনে এই অপকর্ম করে যাবেন?

পরীক্ষার্থীর সেই একই কথা, “স্যার কেরানীর কাজ করে যে বেতন পাওয়া যায়, তা দিয়ে সংসার ঠিকমতো চলেনা, তাই অপকর্ম করতে হচ্ছে। একটু সময় নিয়ে ,আবার বললো, দেশের অনেক রাঘব-বোয়াল কোটি কোটি টাকা বাগিয়ে নিচ্ছে তার তো কোনো হদিসই নাই।

কে কি করছে- সেটা আপনার দেখার দরকার কি! আপনি একটা অন্যায় কাজ করে যাচ্ছেন, সেটা আপনার জানা দরকার। তাছাড়া এই সময় যদি প্রিন্সিপাল সাহেব দেখে ফেলেন তাহলে আমার চাকরী নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে। এই বলে হারুন সাহেব যেই সামনের দিকে হাঁটা শুরু করলেন তখনই তিনি দেখতে পেলেন অদূরেই তার সমবয়সী কয়েকজন যুবক সমানে বই দেখে নকল করে যাচ্ছে। যুবকদের সামনে সে একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতি উত্তরে এক ষণ্ডামার্কা যুবক দাঁড়িয়ে বললো “স্যার, আপনার বাসা কোথায় তা আমরা জানি। এখন বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওই যে সামনে জানালাটা দেখছেন সেখান থেকে ছুঁড়ে একেবারে মাটিতে ফেলে দেবো।”

ভয়ে তো হারুন সাহেবে আত্মাগুড়ুম। পরদিন প্রিন্সিপাল সাহেবকে বললেন তিনি আর পরিদর্শকের কাজ করবেন না। অতি বিনয়ের সাথে জানালেন, প্রিন্সিপাল সাহেব যেন এর কারণ জানতে না চান। এ ব্যাপারে প্রিন্সিপাল সাহেবও আর হারুন সাহেবকে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

এরপর এক বন্ধুর পরামর্শে হারুন সাহেব মধ্যেপ্রাচ্যের দেশ বাহরাইনে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরী নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। সেখানে বছর দুয়েক চাকরী করার পর দেশে এসে এক ধনীর দুলালীকে বিয়ে করেন এবং স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাহারাইনে ফিরে গেলেন। সেখানে তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন এবং তিনি বাবা হলেন। কোথায় গেলো তার সমাজতন্ত্রের দর্শন! আর কোথায় গেলো গরীবের জন্য দরদ! ট্যাক্স বিহীন এবং ভালো

বেতনের চাকরীটা হওয়ার ফলে বাহরাইনে কয়েক বছর কাজ করে অজস্র টাকা পয়সা কামাই করলেন। তার সাথে শ্বশুরবাড়ির একমাত্র কন্যাকে বিয়ের করার সুবাদে দেশে আরো সম্পদ তো জমা রইলো। বিদেশে অনেক সময় কাটানো হয়েছে। মনটা দেশে ফেরার তাগিদ দিচ্ছে। দেখতে দেখতে ছেলের বয়স এখন এগারো বছর। হারুন সাহেব দেশে ফেরার জন্য মনস্থির করলেন। বর্তমান সম্পদের পরিমান হিসাবে উনি একজন ধনী লোকের পর্যায়ে পড়েন। বিদেশে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা থাকার জন্য দেশে অনায়াসেই একটা বেসরকারী কলেজে ভাইস -প্রিন্সিপালের চাকরী পেয়ে গেলেন।

দেশে এসে প্রথমে উনি যে কাজটি করলেন তা বলার মতো নয়। তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বুক ফুলিয়ে এবং গর্বের সাথে ব্যাপারটা বলে বেড়াচ্ছেন। ভাবখানা এমন তিনি কত প্রভাশালী লোক। ছেলে আব্দুর রশিদের জন্মের সার্টিফিকেট তিন বছর কমিয়ে আট বছর বয়স করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, যদিও ছেলে বাহরাইনে জন্মেগ্রহণ করেছে কিন্তু তিনি সার্টিফিকেটে দেখিয়ে দিলেন ঢাকায় জন্মগ্রহণ। সবার মনে সেই একই প্রশ্ন, এ কেমন করে হয়? তিনি জানালেন, “আমাদের দেশে টাকা ছড়ালে মৃত ব্যক্তিকে জ্যান্ত করা কোনো সমস্যাই না।” এক বন্ধু কটাক্ষ করে বললেন, “ভাই, আপনি না একজন প্রফেসর মানুষ, এ সমস্ত কাজ আপনাকে দিয়ে কি সাজে? তাছাড়া এই মিথ্যা কথা বলারই বা কি দরকার ছিল! ছাত্র জীবনে তো আপনি সব সময়ে ন্যায়ের কথা বলে বেড়াতেন।” হারুন সাহেব একটু রহস্য করে বললেন, “আছে, আছে, ছেলেকে তো সরকারী চাকরীতে ঢোকাতে হবে। আর তাছাড়া দেশে থাকতে হলে নানা রকম সুযোগ সুবিধা পেতে হলে এরকম অপকর্ম করার প্রয়োজন রয়েছে। সময়ের সাথে নিজেকে পরিবর্তন করতে হয় তাই করেছি।” আরেক বন্ধু টিটকারি মেরে বললেন “ব্রাভো, ব্রাভো, খুব ভালো কাজ করেছেন।”

বন্ধুর টিটকারি মারাটা হারুন সাহেব খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করলেন না। তিনি ওই বন্ধুর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, “তবে শুনুন আমার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। হারুন সাহেব বলা শুরু করলেন, “বাহরাইনে যাবার আগে দেশে পাঁচ বছরে জন্য পোস্ট অফিসে চার লক্ষ টাকার একটা সঞ্চয় পত্র “ফিক্সড ডিপোজিট” খুলে যাই। পাঁচ বছর পর সঞ্চয়পত্রটি “ম্যাচুর” হবার পর কর্তৃপক্ষ আমাকে কথাটি জানালেন। টাকা তোলার জন্য

এবং তার সাথে আত্মীয় স্বজনদের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাবে এই ভরসায় বাহরাইন থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরলাম। দেশে ফেরার দু দিন পরে আমার টাকাটা উঠাতে পোস্ট অফিসে গেলাম। কাউন্টার অফিসার একখানা ফর্ম আমার হাতে দিয়ে বললেন, "টাকা তোলার ফর্ম খানা পূরণ করে আমার কাছে ফেরত দিলে আমি বাকি কাজগুলো অর্থাৎ যা যা প্রয়োজন তা করে দেব। "কথাটি শুনে খুশি হলাম। যখন ফর্মটা পূরণ করে উনার হাতে দিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, "মাস খানিক পর খোঁজ নিতে, এরই মধ্যে চেক রেডি হয়ে যাবে।" তখন আমি নিরুপায় হয়ে অফিসারকে জানালাম, আমি বিদেশ থেকে এসেছি মাত্র তিন সপ্তাহের সময় নিয়ে, এর মধ্যে দু দিন চলে গেলো, আর আপনি বলছেন আমার টাকা পেতে প্রায় এক মাস লেগে যাবে! আপনি এসব কি বলছেন? বিদেশে তো "ফিক্সড ডিপোজিট বন্ডের" সময় পরিপূর্ণ হলে সোজা বাড়ীর ঠিকানায় চেক পাঠিয়ে দেয়, ব্যাংকেও আসতে হয় না।" আমার কথাটি শুনে অফিসার বললেন, "এটা বিদেশ নয়, এটা বাংলাদেশ এখানে অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। "মনে মনে বললাম বেটা আমাকে নিয়ম কানুন শেখাচ্ছে! প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলাম কত টাকা হলে কাজটা তাড়াতাড়ি করে দিতে পারবেন?" তিনি মুখটা কাচুমাচু করে জানালেন, "আমাদের সবার চা পানির জন্য হাজার খানিক টাকা দিলেই তিন চার দিনের মধ্যে কাজটি করে দেয়া যাবে। কি আর করা! অগ্যতা রাজী হয়ে গেলাম। এ হলো আমার দেশের অবস্থা। এই ঘটনার পর থেকেই আমার মাথায় ঢুকে গেলো সময় এবং পরিবেশের উপর ভিত্তি করে আমাকে চলতে হবে। তা না হলে ওই আদর্শ আর নীতিমালা নিয়ে জীবন চালাতে গেলে জীবনের প্রতি পদে পদে মার্ খেতে হবে।"

ছেলে আব্দুর রাশিদ বড় হয়েছে। সিভিল ইঞ্জিনারিংএ গ্রাজুয়েশন করে ঢাকায় WASA তে (ওয়াটার এন্ড সুয়ারেজ অথরিটি) জয়েন করেছে। বছর খানিক চাকরী করার পর বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটা সরকারী স্কলারশীপ বাগিয়ে নিলো। যদিও স্কলারশিপ পেতে হারুন সাহেবকে উচ্চ মহলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। স্কলারশিপের শর্ত ছিল, কোর্স শেষ করে দেশে ফিরে এসে আব্দুর রশিদকে কমপক্ষে পাঁচ বছর "ওয়াসাতে" কাজ করতে হবে। শর্ত কবুল করে আব্দুর রশিদ আমেরিকার পথে পাড়ি দিলো। সময় মতো কোর্স শেষ হলো। আব্দুর রশিদ দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক সেই সময় হারুন সাহেব ছেলেকে দেশে ফিরতে না করে দিলেন। তিনি ছেলেকে জানালেন, "দেশের অবস্থা ভালো

না তোমাদের মতো যুবকদের বিদেশে থাকাই শ্রেয়।” আব্দুর রশিদ বাবাকে স্মরণ করে দিলো, আমি যে দেশে বন্ড সই করে দিয়ে এসেছি এই বলে যে আমার কোর্স শেষ করার পর আমাকে কমপক্ষে পাঁচ বছর আমার কর্মস্থলে কাজ করতে হবে।” হারুন সাহেব জানালেন, “এ বিষয়ে তুমি কিছু ভেবোনা কয়েক বছর পর এমনিতেই তোমার ফাইল “ডরমেন্ট” হয়ে যাবে, তাছাড়া তুমি তো ক্রিমিনাল নও যে তোমাকে “ইন্টারপোল” লাগিয়ে দেশে ফেরত নিয়ে আসবে” আব্দুর রশিদ বাবার কথায় আশ্বস্ত হয়ে তথাস্তু বলে মেনে নিলো।

হারুন সাহেবের এখন বয়স হয়েছে। নানা রকম বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। মসজিদে যেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছেন আর ভাবছেন সম্পদের পাহাড়টাকে আরো কিভাবে উঁচু করা যায়। আজকাল দেশের প্রভাবশালী মানুষেরা এই মানসিক রোগে ভুগছেন। দেশের অবস্থা দেখে মনে হয়, আলো আর আঁধারের মধ্যে রীতি মতো সংঘর্ষ চলছে। দুঃখের বিষয় আলোর চাইতে আঁধার অনেক শক্তিশালী। তাইতো সর্বত্র আঁধারের জয় জয়কার।#